আতাউস সামাদ স্মারক ট্রাস্ট ফান্ড

আজীবন সম্মাননা, স্মারক বক্তৃতা ও বৃত্তি প্রদান, ২০১৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কাভার

আতাউস সামাদ স্মারক ট্রাস্ট ফান্ড

আজীবন সম্মাননা, স্মারক বক্তৃতা ও বৃত্তি প্রদান, ২০১৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আতাউস সামাদ স্মারক ট্রাস্ট ফান্ড
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আজীবন সম্মাননা, স্মারক বক্তৃতা
ও বৃত্তি প্রদান, ২০১৭

আয়োজনে
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপদেষ্টা
অধ্যাপক মফিজুর রহমান
চেয়ারপারসন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ

আহ্বায়ক
রোবায়েত ফেরদৌস

সদস্য
অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম
ফাহমিদুল হক
সাবরিনা সুলতানা চৌধুরী
শাওন্তী হায়দার
আফরোজা বুলবুল

সম্পাদক
ফাহমিদুল হক

সহকারি সম্পাদক
মার্জিয়া রহমান

Ataus Samad Memorial Trust Fund
University of Dhaka
Lifetime Achievement Award, Memorial Lecture and Student Scholarship Programme, 2017
Organized by Dept. of Mass Communication and Journalism, University of Dhaka, Dhaka 1000.

আজীবন সম্মাননা

গোলাম সারওয়ার

স্মারক বক্তা

সৈয়দ আবুল মকসুদ

স্মারক বক্তৃতা

সাংবাদিকতার দর্শন

সৈয়দ আবুল মকসুদ

এক.

দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে আমি নানা সময় প্রবন্ধ পাঠ করেছি, কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপনের কোনো সুযোগ আমার জন্যে বিশেষ সন্তোষের ও গর্বের। এর আগে আমি দর্শন বিভাগ, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রধানত দর্শন বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেছি। আজ গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ আমাকে 'আতাউস সামাদ স্মারক ট্রাস্ট বক্তৃতা' প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে যে সম্মান দিয়েছেন সেজন্য বিভাগের অ্যাকাডেমিক কমিটির কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ, যদিও এই গুরুদায়িত্ব পালনে আমার যোগ্যতা ও সক্ষমতা সম্পর্কে আমি অত্যন্ত সচেতন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ যাঁর অর্থে এবং যাঁর নামে স্মারক ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছে তাঁদের উভয়েই ছিলেন আমার ঘনিষ্ঠজন। আমি অত্যন্ত গর্বিত যে এ বি এম মূসা এবং আতাউস সামাদের আমি বহু বছর সহকর্মী ছিলাম। আমি এ বি এম মূসার অধীনে কাজ করেছি কয়েক বছর। আতাউস সামাদের সঙ্গে পাশাপাশি টেবিলে কাজ করেছি অনেক দিন। কোনো মানুষকে খুব ভালোভাবে জানার জন্যে এর চেয়ে বড় সুযোগ হয় না। তিন দশকের বেশি আমি যে পেশায় এবং যে দায়িত্বে ছিলাম সেখানে মানুষ সারাক্ষণ কাজ করে না। যতক্ষণ কাজ তার চেয়ে বেশি সময় আড্ডা। সে আড্ডার আলোচ্য বিষয়বস্তু বিচিত্র। মাটির পৃথিবী থেকে গ্রহ-নক্ষত্র পর্যন্ত মহাজগতের এমন বিষয় নেই যা সেই আড্ডায় আলোচনা করা না হতো। এই দুই শ্রদ্ধেয় সাংবাদিকই – তাঁরা সাংবাদিকতা ছাড়া আর কখনো কিছুই করেননি – তুমুল আড্ডাপ্রিয় ছিলেন তা বাংলাদেশের সাংবাদিকতা জগতের সকলেই জানেন। তাঁদের আড্ডা উপভোগ্য ছিল এতটাই যে কখনো সে আড্ডায় বসে গেলে নাট্যাভিনয়, সঙ্গীতানুষ্ঠানের মতো বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানেও যাওয়া হতো না। বাংলাদেশের সাংবাদিকতা জগতের সেই

সৃষ্টিশীল আড্ডার পরিবেশটা এখন আর নেই বলে জানতে পারি। আমার সৌভাগ্য যে আমি এ বি এম মূসা ও আতাউস সামাদের শুধু সহকর্মীই নই, ছিলাম তাঁদের অতি প্রীতিভাজন। এই মুহূর্তে তাঁদের সে ভালোবাসার কথা গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

আজ গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ আয়োজিত এই স্মারক বক্তৃতা দিতে এসে আর একজন মানুষের কথাও মনে পড়ছে। তিনি এই বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা-প্রধান আতিকুজ্জামান খান। মানিকগঞ্জে আমরা একই জায়গার মানুষ। তিনি এ জেড খান নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন আধুনিক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মানুষ। তাঁর মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ খুব কম দেখা যায়। উপমহাদেশের বিখ্যাত পত্রিকা যেমন কলকাতা থেকে প্রকাশিত *স্টেটস্‌ম্যান*, *অমৃতবাজার পত্রিকা*, *হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড*, *স্টার অব ইন্ডিয়া*, এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত *মর্নিং নিউজ*, *দ্য পাকিস্তান অবজারভার* প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি চল্লিশের দশক থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত সাংবাদিকতা করেন। আধুনিক সাংবাদিকতায় বাঙালি মুসলমানের মধ্যে যাঁরা প্রথম দিকে আসেন আতিকুজ্জামান খান তাঁদের একজন। যদিও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে মাস্টার্স করেছিলেন তিনি, কিন্তু সাংবাদিকতায়ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর ছিল। তিনি লন্ডন স্কুল অব জার্নালিজম থেকে সাংবাদিকতায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। দেশের বাইরেও তাঁর খ্যাতি ছিল। আমরা যখন সত্তরের দশকে ইউরোপে সাংবাদিকতায় প্রশিক্ষণ নিতে গেছি তখন লন্ডন এবং কার্ডিফের শিক্ষকদের কেউ কেউ আমাকে এ জেড খানের কথা জিজ্ঞেস করেছেন। তিনি বহু গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তবে খেলাধূলায়, বিশেষ করে ক্রিকেটের ধারাভাষ্যকার তিনি পাকিস্তানে জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর একটি গ্রন্থ *Press in East Pakistan: A Study in Content Analysis* এক সময় সাংবাদিকদের মধ্যে সুপরিচিত ছিল। তাঁর পরামর্শে ষাটের দশকের মাঝামাঝি সাংবাদিকতা বিভাগে ভর্তি হতে এসেও অনিবার্য কারণে আমার আর ভর্তি হওয়া হয়নি। কিন্তু মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলা জনবিরল কলাভবনে তাঁর কক্ষে বসে তাঁর সঙ্গে কথা বলে সমৃদ্ধ হতে পেরেছি।

সাংবাদিকতা বিষয়ে কোনো জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করতে পারবো না বলেই নানা কথা বলে আপনাদের সময়ক্ষেপণ করছি। তবে আতিকুজ্জামান খান, এ বি এম মূসা এবং আতাউস সামাদকে নিয়ে সাংবাদিকতায় উৎসাহী কারো সামনে কথা বলতে আমার ভালোই লাগে।

দুই.

১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে জার্মান কবি ক্লাউস গ্রথ (Klaus Groth, ১৮১৯-১৮৯৯), জীবনের শেষ দিকে যিনি জার্মান ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন, তাঁর এক লেখায় সংবাদপত্রকে বলেছেন 'অপরিহার্য মন্দ' (necessary evil)। তবে তিনি এ কথাও সঙ্গে

সঙ্গে যোগ করেছেন, বস্তু হিসেবে খারাপ হলেও সংবাদপত্রের কাছেই বিপুলভাবে আমি ঋণী আমার অস্বাভাবিক বা অপ্রথাগত শিক্ষাক্রমের জন্য (Nonetheless I am more greatly indebted to the newspaper for the abnormal course of my education than to any person.) এই মন্তব্য তিনি করেছিলেন সংবাদপত্র বিষয়ক *দ্যজ জাইতুঙমিউজিয়াম* সাময়িকী ১৮৯১ সালের নভেম্বর সংখ্যায়।

শিক্ষার উপাদান হিসেবে সংবাদপত্রের মূল্য যে কতটা তা জার্মানির এই কবি ও অধ্যাপকের এই বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু যে জিনিসের এত গুণ তা evil বা মন্দ হয় কী করে? নিশ্চয়ই সংবাদপত্রের মধ্যে প্রয়োজনীয় জিনিসের সঙ্গে evil বা মন্দ উপাদানও যথেষ্ট থাকে।

নৈরাশ্যবাদী জার্মান দার্শনিক আর্থার শোপেনহাওয়ার আমার হিসেবে সংবাদপত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর ভাষায় সংবাদপত্র হলো "Second hand of world history" – বিশ্ব ইতিহাসের দ্বিতীয় হাত। সংবাদপত্র অব্যবহিত অতীতের ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করছে, প্রতিবেদন ও পর্যবেক্ষণ করছে বর্তমানের এবং একই সঙ্গে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য পরিস্থিতির ও পর্যায়ের। এভাবে সংবাদপত্রে "daily course of history", প্রতিদিনের ঘটনাবলির ইতিবৃত্ত লিখে দূর ভবিষ্যতে যে ইতিহাস রচিত হবে তার সব মালমশলাই রেখে যাচ্ছেন পেশাদার সাংবাদিকেরা; সেটা করছেন তারা, শোপেনহাওয়ারের ভাষায়, "by virtue of his intellectual weight and his inner independence." মুক্তসমাজে সাংবাদিকরা সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে আলোচনার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিষয়সংক্রান্ত বিষয়বস্তু নির্বাচন করেন।

কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র ও কমিউনিস্ট দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নেই, সেখানে পত্রপত্রিকা মাত্রেই রাষ্ট্রীয় নীতির প্রচারযন্ত্র। কিন্তু পুঁজিবাদী দেশে নীতিহীন সাংবাদিকতার অবস্থা খুবই শোচনীয়। মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির কঠোর সমালোচক নোয়াম চমস্কি সেখানকার সাংবাদিকতারও ঘোর সমালোচক, তাঁর মতে পশ্চিমের পুঁজিবাদী দেশে শাসকশ্রেণিরই একটি ছদ্মবেশী শাখা সংবাদপত্র। সরকার ও কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো সংবাদপত্রের সহযোগিতায় নিজেদের অবস্থান শক্ত করে, অন্যদিকে তাদের মাধ্যমে মিডিয়াও তার স্বার্থসিদ্ধি করে। ইরাক দখলের সময় আমরা embeded সাংবাদিকদের কথা শুনেছি। তারা ছিলেন যুদ্ধবাজদের শয্যাসঙ্গীর মতো। একটি দেশকে ধ্বংস করছে যারা, তাদের পক্ষে প্রচার চালিয়েছেন সাংবাদিকরা এবং তা ছিল সর্বৈব মিথ্যা প্রচার।

তিন.

সংবাদপত্র স্থান-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ নয়। কোনো ভাষার সংবাদপত্রের চরিত্র এবং সাংবাদিকতার গতি-প্রকৃতি সেই ভূখণ্ডের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক

প্রেক্ষাপটে বিচার্য। বাংলা সাংবাদিকতার ধারা আলোচনার সময় উনিশ ও কুড়ি শতকের অবিভক্ত বঙ্গ, ১৯৪৭ পরবর্তী পূর্ব বাংলা এবং স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন পটভূমিতে বিচার করা উচিত। ওই পর্যায়গুলোর সাংস্কৃতিক, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মূলধারার সাংবাদিকদের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে হবে। উনিশ শতকে বঙ্গদেশে হিন্দুসমাজের একটি অংশে যে নবচেতনার উন্মেষ ঘটে তাতে বহু প্রগতিকামী মনীষীর যেমন অবদান রয়েছে, তেমনি প্রগতিশীল সাংবাদিকদের ভূমিকাও বিরাট। মনীষীদের সমাজে পরিবর্তন আনার যে আকাঙ্ক্ষা তা বাস্তবায়নে সংবাদপত্র সহায়ক হয়েছে। সংস্কারকদের কর্মকাণ্ডের কথা ও তাঁদের চিন্তাধারা শিক্ষিত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বটি পালন করেছে সংবাদপত্র। সমাজ পরিবর্তনে সংবাদপত্র অনুঘটক বা catalyst-এর ভূমিকা পালন করেছে।

উনিশ শতকে সংবাদপত্র বহুল প্রচারিত ছিল না। যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল শোচনীয়। দেশ ছিল বিদেশি ঔপনিবেশিক শাসকদের অধীন। মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছিল সীমিত। সেই পরিস্থিতিতে ঔপনিবেশিক সরকারের রোষানল এবং দেশীয় সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে, শক্ত আদর্শিক অবস্থানের কারণে, লড়াই করে টিকে থাকতে হয়েছে মূলধারার বাংলা সংবাদপত্রকে। সেটা সম্ভব হয়েছে কারণ সেকালে সাংবাদিকতার দর্শন ছিল প্রগতিশীল ও মানবতাবাদী ও সংস্কারমূলক।

বাংলা সংবাদপত্রের প্রথম পর্যায়ে, উনিশ শতকের প্রথম দিকে, সব বাঙালি সম্পাদকেরই 'ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতি পূর্ণ আস্থা ছিল।' তা সত্ত্বেও কোনো কোনো পত্রিকা যেমন *ভাস্কর*, *সোমপ্রকাশ*, *অমৃতবাজার পত্রিকা* প্রভৃতি ব্রিটিশ রাজের কোনো কোনো নীতির সমালোচনা করেছে। মধ্যপন্থী কাগজগুলোর সমালোচনা ছিল আক্রমণাত্মক নয়, গঠনমূলক।

সমাচার দর্পণ (১৮১৮), *সংবাদ কৌমুদী* (১৮২১), *সমাচার চন্দ্রিকা* (১৮২২) থেকে শুরু করে *সোমপ্রকাশ* (১৮৫৮), *অমৃতবাজার পত্রিকা* (১৮৬৮), *সুলভ সমাচার* (১৮৭৩) পর্যন্ত বিখ্যাত সংবাদপত্রগুলো বাংলার সমাজ পরিবর্তন ও নবজাগরণে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখেছে। সংবাদপত্র সতীদাহের মতো অমানবিক সামাজিক-ধর্মীয় প্রথার বিরুদ্ধে লিখেছে, বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কলম চালিয়েছে, বিধবা বিবাহ আন্দোলনে সমর্থন দিয়েছে এবং বহুবিবাহ রোধ ও কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। একটি আধুনিক মানবিক সমাজ বিনির্মাণে সংস্কারকদের সহযোগী ছিলেন সাংবাদিকেরা।

তারপর পরাধীনতার মধ্যেও আসে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের বিষয়। ঔপনিবেশিকতাবিরোধী আন্দোলনে মানুষের মধ্যে স্বাদেশিকতার চেতনা সঞ্চার করতে সংবাদপত্রের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি। রাজনৈতিক নেতাদের বাণী মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেবার মধ্য দিয়ে জনমত গঠনে সংবাদপত্রের মতো বড় ভূমিকা আর কোনো

শক্তিই পালন করতে পারেনি। উল্লেখযাগ্য যে, একই সময় প্রতিক্রিয়াশীল ও রক্ষণশীলদেরও সংবাদপত্র ছিল, কিন্তু সেই সংবাদপত্রের দার্শনিক বা আদর্শিক ভিত্তি ছিল না। প্রচলিত বিশ্বাস আঁকড়ে পড়ে ছিল সেগুলো। সুতরাং সমাজের পরিবর্তনকামীদের কাছে তার কোনো আবেদন ছিল না।

১৮৬৮-র ২০ ফেব্রুয়ারি *অমৃতবাজার পত্রিকা* আত্মপ্রকাশ করে। সেটি ছিল একটি প্রগতিশীল পত্রিকা, যার আদর্শবাদিতা ও নীতিবোধ বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে স্মরণীয়। কাগজটি সরকারকে শক্ত ভাষায় সমালোচনা করেছে এবং বিভিন্ন সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে ও নীলবিদ্রোহের সমর্থনে প্রতিবেদন করেছে। *অমৃতবাজার* স্বাদেশিকতার চেতনা সাবলীলভাবে প্রকাশ করেছে। যখন "উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালি ইংরেজ সাম্রাজ্যকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ" করেছে এবং কোনো কোনো পত্রিকা লিখেছে, "ইংরাজরা কেবল রাজা নহেন, আমাদের উদ্ধারকর্তা বলিলেও হয়। আমরা আর্য্য জাতি, আমাদের পূর্বপুরুষেরা অনেক উন্নতি করিয়াছেন ইহা বলিয়া আন্দোলন করা কাপুরুষতা মাত্র। ...যাহারা কেবল ইংরাজের নিন্দা করিয়া বড়লোক হইতে চায়, দেশহিতৈষী হইতে চায়, তাহাদের অপেক্ষা মহামূর্খ জগতে নাই" [*সুলভ সমাচার*, কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদিত, ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১২৮১], সেই সময় সাপ্তাহিক *অমৃতবাজার পত্রিকা* (পরে দৈনিক) তার প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে সম্পাদক শিশির কুমার অঙ্গীকার করেছেন, যা নিন্দনীয় তাকে "নিন্দা" করবেন। অর্থাৎ বলতে চেয়েছেন সরকারের সমালোচনা করবেন এবং সমাজের যারা শত্রু তাদের "গালি" দিবেন। তাঁর ভাষায়: "...গালি ও নিন্দা সংবাদপত্রের জীবন, শুদ্ধ সংবাদপত্র কেন, গালি ও নিন্দা চর্চা রহিত করিলে মানুষের মধ্যে পরস্পরের কথোপকথনও রহিত হইবার সম্ভাবনা। একথা নিতান্ত অসঙ্গত নয় যে অপরের নিন্দাচর্চা করিব না তবে পত্রিকা বাহির করার প্রয়োজন কী।"

নিন্দা শব্দে তিনি বুঝিয়েছিলেন সমালোচনা করাকে। যা সমাজের জন্য ক্ষতিকর সংবাদপত্র তার সমালোচনা করবে।

উনিশ শতকে বাঙালি হিন্দু সমাজের যে অংশে জাগরণ আসে এবং গড়ে ওঠে একটি আলোকিত বাঙালি সমাজ, যা শিল্প-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছে, অনেক উঁচুতে তুলেছে বাঙালি জাতিকে, তার পেছনে সংবাদপত্রের ভূমিকা বিরাট। প্রগতিশীল সমাজসংস্কারমূলক কাজে এবং মানবমুক্তির যে কোনো প্রচেষ্টায় চিন্তাবিদদের আত্মপ্রকাশের প্রয়োজন ছিল। সেই কাজে প্রধান মাধ্যম ছিল সংবাদপত্র। বিভিন্ন মতের ও পথের সমন্বয়ের ফলেই বাংলার কথিত রেনেসাঁ একটি পথ খুঁজে পেয়েছিল। এই সময়ে বহু মনীষী নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের আত্মত্যাগ ছিল সীমাহীন। তাঁদের কাজ ও চিন্তা নিয়ে বিতর্ক বা বাদ-প্রতিবাদ হয়েছে। সেই বিতর্ক ও বাদ-প্রতিবাদের জন্য যে গণমাধ্যমের প্রয়োজন ছিল বাংলা সংবাদপত্রকে সেই ভূমিকায় দেখা গেছে। তা ছাড়া বাঙালি চিন্তাবিদদের অনেকে নিজেরাই তাঁদের মতামত প্রকাশের জন্য সংবাদপত্র ও

সংবাদ সাময়িকী প্রকাশ করেছেন।

বিভিন্ন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অনেক পত্রিকা সমর্থন দিয়েছে, যেমন *সোমপ্রকাশ* মাতৃভাষা বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাবে সমর্থন দিয়েছে এবং "ইংরাজী শিক্ষার অনিষ্টকারিতা" সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করেছে। মফস্বলের পত্রিকা হলেও কুমারখালী থেকে প্রকাশিত হরিনাথ মজুমদারের *গ্রামবার্তা প্রকাশিকা* জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় লিখেছে। এমন কি তাঁর এলাকার প্রভাবশালী জমিদার, বাংলার হিন্দুসমাজের নবজাগরণে যাঁর অবদান অসামান্য, সেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরুদ্ধেও প্রতিবেদন করেছে। *সোমপ্রকাশ* প্রভৃতি দেশীয় জমিদার ও বিদেশীয় নীলকরদের অত্যাচার ও শোষণ নিয়ে কঠোর ভাষায় লিখেছে।

বাঙালি জাতির উন্নতির জন্য উন্নতমানের বাংলা সংবাদপত্রের ও সাময়িকীর প্রয়োজন রয়েছে, সেকথা দেড়শ বছর আগেই বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা উপলব্ধি করেন। তবে তাঁরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করেন সেকালের শিক্ষিত বাঙালিরা বাংলা সংবাদপত্র-সাময়িকীর চেয়ে ইংরেজি সংবাদপত্রেরই বেশি কদর করেন। অথচ সমাজের বেশি সংখ্যক মানুষের মধ্যে পৌঁছার জন্য মাতৃভাষার সংবাদপত্র ও সাময়িকীর ভূমিকাই বেশি। সর্বসাধারণের জন্য "জ্ঞানবস্তু" বিতরণের জন্য সংবাদপত্রের কোনো বিকল্প নেই। এবং জ্ঞান ও উন্নত চিন্তার চর্চা ছাড়া "বাঙালির উন্নতির" সম্ভাবনা নেই। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর *বঙ্গদর্শন*-এর প্রথম সংখ্যায় দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছিলেন: "যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ বা সাময়িকপত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের বিশেষ দূরদৃষ্ট। তাঁহারা যত যত্ন করুন না কেন, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় প্রায়ই তাহাদিগের রচনাপাঠে বিমুখ। ...তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষায় লেখকমাত্রেই হয়ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপিকৌশল শূন্য, নয়ত ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদক। ...যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্তু বাঙালিরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তিসকল বিন্যাস্ত করিবেন, ততদিন বাঙালির উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।"

চার.

রাষ্ট্রের আদর্শের বিরুদ্ধে গিয়েও সংবাদপত্র টিকে থাকতে পারে না, কিন্তু রাষ্ট্রের আদর্শের ক্ষতিকর বিষয়ের দিকে সরকার ও জনগণকে সচেতন করে দিতে পারে। ১৯৪৭-এর পর বাংলার প্রগতিশীল সংবাদপত্র পাকিস্তান সরকারের সাম্প্রদায়িক নীতির বিরুদ্ধে লিখেছে। বিশেষ করে বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের পর থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত করতে এবং স্বায়ত্তশাসনের দাবির পক্ষে জনমত গঠনে *ইত্তেফাক*, *সংবাদ* প্রভৃতি পত্রিকা অবিচল ছিল। সেজন্য ওইসব পত্রিকার সম্পাদক-প্রকাশক সরকারি নির্যাতন ভোগ করেছেন। রাজনৈতিক নেতাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে প্রগতিশীল কাগজগুলো অতুলনীয় ভূমিকা পালন করেছে। একই সময় শাসকশ্রেণির পত্রিকা *আজাদ*, *পয়গাম* প্রভৃতির অস্তিত্ব ছিল। এসব পত্রিকারও পাঠক ছিল। কিন্তু আদর্শিক লড়াইয়ে তারা পরাভূত হয়।

পূর্ব বাংলার মানুষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত নিয়ে আসতে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সাংবাদিকেরা একযোগে কাজ করেছেন। তারপর একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় সেই রাষ্ট্রের মূলনীতিগুলোর ভিত্তিতে একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রধান পত্রিকাগুলো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিও বসে থাকে না। সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় মৌলবাদ তাদের পুঁজি। বর্তমানে বাংলাদেশের মূলধারার পত্রিকাগুলোর প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে সমাজে মৌলবাদী তৎপরতা প্রতিরোধে ব্যাপক জনমত গঠন করা এবং যুবসমাজকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলা।

আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শুধু ঘটে যাওয়া ঘটনার বিবরণ নয়, শুধু ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের বক্তৃতা-বিবৃতিও নয়, রাষ্ট্রের ভেতরে লোকচক্ষুর আড়ালে কী ঘটছে সেসব কথা মানুষ জানতে চায়। আধুনিক সংবাদপত্র সে কাজটি করছেও। তা করতে গিয়ে সমালোচনামূলক কর্তৃত্বের বা critical authority-র ভূমিকা পালন করে আধুনিক সংবাদপত্র এবং তার বিশেষজ্ঞ লেখকেরা, বিশেষ করে যাঁরা উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখেন। একালে যাঁদের বলা হয় কলামিস্ট বা কলাম লেখক।

যে জিনিস মানুষের মঙ্গল করার ক্ষমতা রাখে তার অবশ্যই একটি দার্শনিক ভিত্তি এবং নৈতিক দিক থাকে। কল্যাণ কী, ভালো বা মন্দ কী – এ সম্পর্কে সংবাদপত্রের প্রকাশক, সম্পাদক এবং সাংবাদিকদের সুস্পষ্ট ধারণা বা নীতিবোধ অবশ্যই থাকতে হবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো সব সম্পাদক ও সাংবাদিকের নীতিবোধ সমান নয়, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থের কাছে অনেকে নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দেন। সেজন্য ফিলসফি অব জার্নালিজম বা সাংবাদিকতার দর্শন খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আমি যাকে বলছি 'সাংবাদিকতার দর্শন' তা হলো আদর্শবাদী সাংবাদিকতা। যে সংবাদপত্র জনকল্যাণের পক্ষে কাজ করে, সত্য সমুন্নত রাখার অঙ্গীকার করে, সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে চায়, সমাজের অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে, সেই পত্রিকাই আদর্শবাদী। সেই পত্রিকা মানবতাবাদী দর্শন দ্বারা পরিচালিত। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা সাংবাদিকতার সোয়া দুই শ বছরের ইতিহাসে বাংলা সংবাদপত্রে তিনটি ধারাই সমান্তরালভাবে রয়েছে: প্রতিক্রিয়াশীল, রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল। তবে মূলধারার পত্রিকা মধ্যপন্থী। তাদের প্রভাবই সমাজে সবচেয়ে বেশি।

ধর্মান্ধতা সমাজের শত্রু। তা দূর করার চেষ্টা করাই উন্নত সাংবাদিকতার নীতি হওয়া উচিত। তা আরো বাড়িয়ে দেওয়া মানবতাবিরোধী কাজ। বাংলাদেশে ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক মানুষের সংখ্যা খুব কম নয়। তাদেরকে উত্তেজিত করে বিপর্যয় ঘটানো কঠিন নয়। ভারতে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর ওই দিনই ঢাকার একটি দৈনিক প্রতিবেদন করে হিন্দুরা খুশিতে মিষ্টান্ন বিতরণ করেছে। তার ফল যা হওয়ার তাই হয়। হিন্দুদের অনেকের দোকান ও বাড়িঘরে হামলা করে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর দুর্বৃত্তরা। প্রতিক্রিয়াশীল

সরকারেরও মৌন মদদ ছিল। ওই পত্রিকার নীতি সাংবাদিকতার দর্শনের পরিপন্থী। ওই পত্রিকার ভূমিকা সমাজবিরোধী।

পাঁচ.

ফিলসফাররা জীবন ও জগতের সব বিষয় যুক্তিবৃত্তি (Reason) দিয়ে বিশ্লেষণ করেন। সংবাদপত্র দার্শনিকের তত্ত্বকথা পরিবেশন করে। দার্শনিকেরা যেমন জীবনের গভীর সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন, এ কালের সংবাদপত্রও জীবনের দৈনন্দিন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্টের সময় থেকেই দর্শন ও সংবাদপত্রের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। সংবাদপত্রের ভূমিকা নিয়ে আজ দার্শনিকদের নানা প্রশ্ন।

এক দেড়শ বছর আগে সংবাদপত্রের চরিত্র ও সাংবাদিকতার ধারা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কেউ ছিল না। আজ বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকতা একটি ডিসিপ্লিন – পাঠ্যবিষয় বা জ্ঞানের শাখা। সাংবাদিকতার ধারা নিয়ে গবেষণা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পর্যায়ে। সাধারণ পাঠকও অনেক অগ্রসর, তার চেতনার মান অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় উঁচু। কোন সংবাদমাধ্যম কোন উদ্দেশ্যে কী বলতে চাইছে, কোন দিকে তার গতি, তা পাঠকের রাডারে ধরা পড়ে।

ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকো ১৮ শতকের 'আলোক-যুগ'-এর উপর আলোচনায় ইমানুয়েল কান্ট ১৭৮৪-র একটি সাময়িকীতে যা বলেছিলেন তার উল্লেখ করে বলেন: Today, when a periodical asks its readers a question, it does so to collect opinion on some subject about which everybody has an opinion already: there is not much likelyhood of learning anything new. In the 18th century, the Age of Enlightenment, editors preferred to question the public on problems that did not yet have solutions. I do not know whether or not the practice was more effective; it was unquestionably more entertaining.

আঠার শতকে জার্মানির সাংবাদিকেরা জানতেন না 'জ্ঞানবিভাসিত সমাজ' কী? উনিশ শতকে বাঙালি সাংবাদিকেরা জানতেন না উৎকৃষ্ট সাংবাদিকতা কী? যেমন, ফুকোর ভাষায়: Let us imagine that the German journal still exists and is asking its readers the question: What is modern philosophy? Perhaps we could respond with an echo: modern philosophy is attempting to answer the question raised so impudently two centuries ago: Was ist Augkalrung − What is Enlightenment?

আলোকিত সমাজ নির্মাণ, অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করা আদর্শ সংবাদপত্রের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। সমাজে শিক্ষার প্রসার ঘটানো রাষ্ট্রের কাজ, সমাজকে আলোকিত বা enlighten করা সংবাদপত্রের দায়িত্ব।

শুধু উনিশ ও কুড়ি শতকের সংবাদপত্র নয়, বর্তমানকালের সংবাদপত্র কি প্রকৃত গণমাধ্যম হিসেবে গণ্য হতে পারে? দেশের মানুষের একটি বড় অংশ নিরক্ষর অথবা খুবই সামান্য শিক্ষিত কিংবা খবরের কাগজ পড়েন বা পড়বার সুযোগ পান। বিশেষ শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যেই সংবাদপত্র আবদ্ধ। তাই সংবাদপত্র জাতীয় জাগরণে তথা সমাজ পরিবর্তনে কতটা সহায়ক হতে পারে?

সাধারণ পাঠক সংবাদপত্রকে একটি বিনোদনের বস্তু হিসেবেই দেখে থাকেন বলে অনেক সাংবাদিকতা বিশেষজ্ঞের অভিমত। সংবাদপত্র পাঠকের রুচির সঙ্গে আপস করে। তারা যা পছন্দ করবে তেমন জিনিসই তাঁরা পরিবেশন করতে চান। সাধারণ মানুষের বিশ্বাসে আঘাত করতে পারে তেমন সংস্কারমূলক প্রচারণা জনপ্রিয় সংবাদপত্র এড়িয়ে চলে। এবং ঝুঁকি নিয়ে জনসাধারণের বিরাগভাজন হতে চায় না।

জীবনস্মৃতিতে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন: "এ জগতে কিছুই নিষ্ফল নহে। একখানি সাময়িকপত্রের ক্ষণিক জীবনও নিষ্ফল হইবে না। যে সকল নিয়মের বলে, আধুনিক সামাজিক উন্নতি সিদ্ধ হইয়া থাকে, এই সকল পত্রের জন্ম, জীবন এবং মৃত্যু তাহারই প্রতিক্রিয়া। ...কালস্রোতে এই সকল জলবুদ্বুদ মাত্র। এই বঙ্গদর্শন কালস্রোতে নিয়মাধীন জলবুদ্বুদস্বরূপ ভাসিল, নিয়মবলে বিলীন হইবে। অতএব ইহার লয়ে আমরা পরিতাপযুক্ত বা হাস্যস্পদ হইব না। ইহার জন্ম কখনই নিষ্ফল হইবে না।"

এই বক্তব্যটি শুধু বঙ্গদর্শনের ক্ষেত্রে নয়, জাতীয় জাগরণে ও সামাজিক আন্দোলনে যে সংবাদপত্র ও সাময়িকীই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

সুন্দর শান্তিপূর্ণ সমাজ নির্মাণ একটি প্রগতিশীল পত্রিকায় পলিসি হওয়ার কথা, সমাজে হানাহানি বাড়ানোর পরিবেশ সৃষ্টি করা নয়। চল্লিশের দশকে বাংলার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিন্দুদের *আনন্দবাজার পত্রিকা*, *হিন্দুস্তান স্টান্ডার্ড* এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের *আজাদ* ক্ষতিকর ভূমিকা রাখে। বঙ্গীয় কংগ্রেসের নেতা কিরণশংকর রায়কে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু একান্ত ব্যক্তিগত চিরকুটে লিখেছিলেন: "হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার জন্য হিন্দুদের *আনন্দবাজার* পত্রিকা এবং মুসলমানদের *আজাদ* দায়ী।" নেহেরু নিজে ছিলেন আধুনিক অসাম্প্রদায়িক নেতা। তাঁর কংগ্রেসপন্থী নেতা-কর্মীরাও যে মুসলমান নিধনের ইন্ধন জোগান সে কথা তিনি কিরণশংকর রায়কে বলতে দ্বিধা করেননি। চল্লিশের দশকের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের রক্তপাতের জন্য সংবাদপত্রের ভূমিকা নিন্দনীয়।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় ষাটের দশকে শান্তিবাদী দার্শনিক বারট্রান্ড রাসেল ছিলেন মার্কিন সমরনীতির কঠোর সমালোচক। ভিয়েতনামে মার্কিন বর্বরতার প্রতিবাদে তিনি

পত্রপত্রিকায় লিখেছেন, সভা-সমাবেশ করেছেন। তেমন এক প্রতিবাদমূলক চিঠি লিখেছিলেন *দ্য নিউইয়র্ক টাইমস*-এর পাঠকের পাতায়। সেই চিঠির কিছু বাক্য বাদ দিয়ে ছাপা হয়। তা নিয়ে সম্পাদকের সঙ্গে রাসেলের বাদ-প্রতিবাদের কথা সেকালে আলোচ্য বিষয় ছিল। *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর অসাধুতার মুখোশ উন্মোচন করেন রাসেল। আমেরিকার বাহিনীর যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে রাসেলের চিঠির কিছু কথা বাদ দিয়ে কেন ছাপা হয় তার জবাব চান তিনি। সম্পাদক জানান, লেখা সম্পাদনার এখতিয়ার সম্পাদকীয় বিভাগের রয়েছে। তাঁর জবাবে ক্ষিপ্ত রাসেল এক কড়া চিঠি দিয়ে সম্পাদককে লেখেন, "হ্যাঁ, লেখা সম্পাদনার অধিকার পত্রিকার রয়েছে বটে এবং কোনো বাক্য বাদ দেওয়াও যায়, তবে যেখানে বাদ দেবেন সেখানে দিতে হবে তিন ফোঁটা [...]। তা না দিয়ে *নিউইয়র্ক টাইমস* অসাধুতার পরিচয় দিয়েছে।"

বহু বছর আগে ব্রিটেনের মিডিয়া মোগল লর্ড থমসন ঘোষণা করেছিলেন তাঁর কাছে সংবাদপত্র হলো "...are something like public property and act to a high degree as public services." সংবাদপত্র অনেকটাই যেন জনগণের সম্পত্তি এবং তা অতি উচ্চমাত্রার জনসেবামূলক দায়িত্ব পালন করে থাকে। শিক্ষকতা যেমন একটি পেশা, একই সঙ্গে তা জনসেবাও। মানুষকে শিক্ষা বা বিদ্যা দান করার চেয়ে মহৎ কিছু দান করা যায় না। সংবাদপত্রের একটি শিক্ষামূলক ভূমিকা রয়েছে। সংবাদপত্রের বড় গুণ তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে খুব অল্পশিক্ষিত ও দরিদ্র মানুষ থেকে খুব বিদ্বান ও বিত্তবান মানুষও। কারণ সংবাদপত্রে সব জিনিসই থাকে। যার যেটা প্রয়োজন, সে সেটাই নেয়। চাল-ডালের দামের কথা যেমন থাকে, প্রতিদিনের সমস্যার কথা যেমন থাকে, তেমনি অতি উঁচু দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক বিষয়ও থাকে। চোরাচালানি ও দূর্বৃত্তের সমালোচনা থাকে এবং পরাক্রান্ত সরকারের সমালোচনাও থাকে। বিচিত্র বিষয় সংবাদপত্র ধারণ করে বলে একখানি বইয়ের চেয়ে একটি উন্নতমানের সংবাদপত্র বেশি সার্বজনীন।

সংবাদপত্র এখন একটি শিল্প-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। সেখানে নিয়োগ করতে হয় বিরাট পুঁজি। সুতরাং পাঠকসেবা বা জনসেবা করতে গিয়ে তার পক্ষে লোকসান দিয়ে টিকে থাকা সম্ভব নয়। তবে মালিকের কাজ শুধু লাভ-লোকসানের দিকটিই দেখা। লর্ড থমসনও বলতেন প্রকাশক শুধু বাণিজ্যিক দিকগুলো দেখাশোনা করবেন, সম্পাদকীয় দায়িত্ব আলাদা, কারণ পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয়বস্তু পাঠকের, তা প্রকাশিত বিষয়বস্তুর সত্যনিষ্ঠতার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে সম্পাদক নির্ধারণ করবেন, পত্রিকার মালিক নন। কারণ "the newspapers belong to the readers"।

তিনি তাত্ত্বিকভাবে বলেছিলেন, সত্য ও সত্যই গুরুত্ব পাবে সংবাদপত্রে – "the truth and nothing but the truth"। সংবাদ পরিবেশনায় সত্য ছাড়া আর কিছুই মূল্যবান নয়।

উনিশ শতকে পশ্চিমে সংবাদপত্রের দু'রকমের ভূমিকার কথা বলা হতো, হয়তো

আলোক প্রজ্জ্বলনকারী – 'bringer of light', অথবা যাবতীয় মন্দের মূল – 'root of all evil'। তবে তা নির্ভর করে সংবাদপত্রবিশেষের সাংবাদিকদের চরিত্রের উপর।

রাষ্ট্রের চরিত্র এবং সরকারের নীতি সংবাদপত্রকে প্রভাবিত করে। যে রাষ্ট্র উদার গণতান্ত্রিক সে রাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যমও উদার ও প্রগতিশীল হবে। মধ্যপ্রাচ্যের যেসব রাষ্ট্রে রাজতন্ত্র, যেখানে গণতন্ত্র নেই, সেখানে স্বাধীন সংবাদপত্র প্রকাশ সম্ভব নয়। কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রেও সাংবাদিকেরা স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন না। তবে রাষ্ট্র যাতে স্বৈরাচারী বা কর্তৃত্ববাদী হয়ে না ওঠে সেই দিকে জনমত গড়ে তোলাও সাংবাদিকের কর্তব্য। মিয়ানমারের সাংবাদিকদের দার্শনিক ভিত্তি শক্ত হলে আরাকানের রোহিঙ্গাদের ওপর যে পাশবিক নির্যাতন হচ্ছে তার বিরুদ্ধে তারা লিখতেন। যে কোনো সত্যকে আড়াল করা সাংবাদিকতার নৈতিকতাবিরোধী। আলজেরিয়া এবং মরক্কোতে যখন ফরাসি সৈনিকেরা বর্বর অত্যাচার করে স্বাধীনতাকামীদের দমন করত, তখন জাঁ-পল সার্ত্রে, জাঁ জেনে প্রমুখ দার্শনিক-বুদ্ধিজীবী তার প্রতিবাদে তাঁদের কাগজগুলোতে লিখেছেন।

পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের সংবাদপত্র সীমিত স্বাধীনতা ভোগ করেছে। সেই অবস্থায় যারা একটু বেশি স্বাধীনতা ভোগ করতে গেছে, তাদের উপর নেমে এসেছে খড়্গ। পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের পক্ষে যারা লিখেছেন তাঁদের জেল-জুলুম ভোগ করতে হয়েছে। কোনো কোনো সংবাদপত্রের ছাপাখানায় সরকার তালা লাগিয়ে দিয়েছে। তার ভেতরেও সাংবাদিকেরা কোনো রকমে কাজ করে গেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে স্বাধীন সংবাদপত্র প্রকাশ সম্ভব নয়। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তানি সামরিক জান্তার অধীনে। তখনও বাংলাদেশ থেকে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে। বন্দুকের নলের মুখে সাংবাদিকতা হয় না। একাত্তরে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রকে কি সংবাদপত্র বলা যায়? সামরিক জান্তার পছন্দমতো খবর ছাড়া তাতে কোনো বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ থাকত না। মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ বর্জিত সেদিনের কোনো পত্রিকাই সাংবাদিকতার দায়িত্ব পালন করেনি। অবরুদ্ধ দেশে তা সম্ভবও ছিল না। অথচ সেই অবরুদ্ধ পরিবেশেই বিদেশি গণমাধ্যমের জন্যে মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ পরিবেশন করেছেন নিজামউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নাজমুল হক ও আরো অনেকে। তার জন্য তাদের মূল্য দিতে হয়েছে। জীবন দিয়েছেন রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের সংবাদপত্র, যার প্রায় সবই প্রকাশিত হতো কলকাতা থেকে, সীমিত স্বাধীনতার মধ্যেও স্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছে। সংবাদপত্রের সহযোগিতা ও সমর্থন ছাড়া শুধু রাজনৈতিক নেতাদের পক্ষে বড় বড় আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। সরকারবিরোধী স্বাধীনতাসংগ্রামীদের সমর্থন দিতে গিয়ে অনেক পত্রিকার সম্পাদককে কারা নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। নজরুল ইসলামের *ধূমকেতু* বন্ধ হয়ে যায়। তাঁকে ভোগ করতে হয় কারা নির্যাতন। আতাউস

সামাদ কোনো অপরাধ করেননি, দুর্নীতি করেননি, কারো সম্পত্তি আত্মসাৎ করেননি, শুধু লেখার কারণে স্বৈরাচারী সামরিক শাসক এরশাদের আমলে কারাবরণ করেন। তিনি ছিলেন নরম মনের মানুষ। যেভাবে তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেলে নিয়ে অনেকদিন রাখা হয় তা তাঁর হৃদযন্ত্রকে দুর্বল করে দেয়। মুক্তি পাবার পরে তিনি যখন হাসপাতালে ভর্তি হন আমি প্রায়ই তাকে দেখতে যেতাম। ডাক্তাররা বলতেন কারাভোগ তাঁর হৃদরোগের অন্যতম কারণ।

দায়িত্বশীল সাংবাদিক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সমাজ ও রাষ্ট্রের নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক। সংবাদপত্র watchdog বা নজরদারির কাজটি করে স্বাধীন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে। সে জন্যেই আঠার শতকের উদার গণতন্ত্রের প্রবক্তা ও চিন্তাবিদ এডমুন্ড বার্ক সংবাদপত্রকে fourth estate বলে আখ্যায়িত করেছিলেন যা আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। রাষ্ট্র তার সাংবিধানিক ক্ষমতা তার জনগণের ওপর কতটা যথাযথভাবে ব্যবহার করছে আর কতটা অপব্যবহার করে জনগণের নাগরিক অধিকার খর্ব করছে তা নিরপেক্ষভাবে নজরদারি করে সংবাদপত্র। মতাদর্শ নির্বিশেষে সামগ্রিক সমাজের প্রতিনিধিত্ব করার প্রয়োজনে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা থাকা জরুরি।

একটি দৃষ্টান্ত হাজির করছি। যখন দরিদ্র পরিবারের ছেলে লিমন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর সদস্যদের নির্যাতনে পা হারায় তখন রাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, কোনো রাজনৈতিক দল বা সমাজের প্রভাবশালী কোনো শ্রেণিও তার পক্ষে দাঁড়ায় না, তখন *প্রথম আলো*, *দ্য ডেইলি স্টার*সহ দুই তিনটি সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মাধ্যম রাষ্ট্রের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তার পক্ষ নেয়। সেটি ছিল খুব বড় একটি নৈতিক দায়িত্ব পালন। মিডিয়া তার পাশে না থাকলে লিমন শেষ হয়ে যেত।

বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হেফাজতে নিহতদের 'ক্রসফায়ারে'র ঘটনার প্রতিবেদন করতে গিয়ে আমাদের পত্রিকাগুলো 'ক্রসফায়ার' শব্দটি ঊর্ধ্বকর্মার মধ্যে লেখে, যা খুবই অর্থবহ, অর্থাৎ পত্রিকা বিশ্বাস করছে না ওটি সত্যি ক্রসফায়ার।

দু-একটি ক্ষেত্রে ব্যক্তির মানবাধিকার রক্ষায় এগিয়ে এলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংবাদপত্র রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তিতে আঘাত করতে পারে না, তা করলে ওই সংবাদপত্রের অস্তিত্বই বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো থেকে টাকা আত্মসাৎ করছে প্রভাবশালী গোষ্ঠী, তার বিরুদ্ধে শুধু লিখতেই পারে সংবাদপত্র, কিন্তু তা প্রতিরোধ করার শক্তি নেই। সাংবাদিকেরা সমস্যা তুলে ধরতে পারেন, সমাধানের দায়িত্ব রাষ্ট্রনেতাদের।

ঊনিশ ও কুড়ি শতকে বাংলা সংবাদপত্রকে লিখতে হয়েছে ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে, বহু বিবাহের বিরুদ্ধে, বিধবা বিবাহের পক্ষে, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সমর্থনে। নানা রকম সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে তো বটেই।

আজ সাংবাদিকের দায়িত্ব রয়েছে বহু সমস্যা নিয়ে লেখার। নয়া

ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, বিশ্বায়নের সমস্যা, দুর্নীতি, নারী নির্যাতন, মানবাধিকার লঙ্ঘন, পরিবেশ দূষণ, সাম্প্রদায়িকতা, বাল্যবিবাহ, সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ, আধিপত্যবাদ, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর প্রবলের নির্যাতন এবং সবচেয়ে বেশি যা তা হলো গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই। গণতন্ত্র রক্ষা শুধু রাজনীতিকদের কাজ নয়, তাতে সংবাদপত্রের ভূমিকাও সমান। সাংবাদিকের কর্মক্ষেত্র আজ বহুবিস্তৃত। এই পরিস্থিতিতে আদর্শবাদী সাংবাদিকের প্রয়োজন আজ অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি। সব সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে লেখা ও জনগণের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের দায়িত্ব সংবাদপত্র স্বপ্রণোদিত হয়ে নিজের কাঁধে নিয়ে নিয়েছে। সেই দায়িত্ব যে সম্পাদক ও সাংবাদিকেরা যত সাবলীলভাবে পালন করেন তাঁরাই এবং তাঁদের পত্রিকাই শ্রেষ্ঠ।

বহু ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি-পেশা ও দলমতের সমাজে মতাদর্শগত ব্যবধান না বাড়িয়ে কমিয়ে আনার কাজটি দায়িত্বশীল সংবাদপত্র করে থাকে। রাষ্ট্রের মূলনীতিকে সমুন্নত রাখার দায়িত্ব সংবাদপত্রের, তারপর ভিন্নমতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার বিষয় সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় নিবন্ধে হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে সংবাদপত্রের ভূমিকা সীমাহীন। বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের সংবিধান অঙ্গীকার করেছে, এটি হবে একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যেখানে রাষ্ট্রের সঙ্গে কর্মের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। সেই অবস্থাটি এখনো আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। দলীয় আনুগত্য যা-ই হোক, বাংলাদেশের সাংবাদিকতার আদর্শ হওয়া উচিত রাষ্ট্রের মূলনীতির প্রতি অনুগত থাকা এবং একটি ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে অতন্দ্র প্রহরীর মতো জাগ্রত থাকা।

একজন প্রখ্যাত অস্তিত্ববাদী দার্শনিক কার্ল ইয়েসপার্স বলেছেন, Great journalists beget veracity – মহান সাংবাদিকেরা সত্যনিষ্ঠতার জন্ম দেন। তিনি এ কথাও বলেছেন, সবার পক্ষে 'মহান সাংবাদিক' হওয়া সম্ভব হয় না। তবে মহান হওয়ার সাধনা থাকা উচিত সবার মধ্যেই। যদিও সবার বুদ্ধিবৃত্তিক সহজাত ক্ষমতা সমান নয়। সর্বাত্মকভাবে সাংবাদিকতা পেশায় নিজেকে যদি কেউ নিয়োজিত করতে চান, তিনি বলেছেন, তার থাকতে হবে উচ্চমাত্রার আদর্শবাদ – a strong dose of idealism.

সত্তরের দশকে আমি যখন সাংবাদিকতায় প্রশিক্ষণ নিতে জার্মানিতে যাই, দার্শনিক ইয়েসপার্স তার কয়েক বছর আগে ৮০ বছর বয়সে মারা যান। তাঁর চিন্তাধারা ও দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে তখন আলোচনা হচ্ছিল। সে রকম একটি আলোচনায় আমি বার্লিনের ফ্রি ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট অব ফিলসফিতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি মনে করতেন সাংবাদিকতা একটি উঁচুস্তরের মহান পেশা। উঁচু আদর্শভিত্তিক না হলে সে খবরের কাগজের মূল্য নেই। তাঁর একটি কথা এ রকম: "The sort of journalists a nation

produces – is today an essential factor of its destiny." একটি জাতি যে মাপের ও যেমন চরিত্রের সাংবাদিক তৈরি করে তার নিয়তিও তেমনি হয়। সেই নিয়মের ব্যতিক্রম নয় বাংলাদেশও।

যিনি আজীবন সম্মাননা পেলেন

গোলাম সারওয়ার

বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে গোলাম সারওয়ার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। ষাট দশকে সাংবাদিকতার শুরু থেকে একটানা ৫০ বছরের বেশি সময় তিনি এই পেশায় মেধা, যুক্তিবোধ, পেশাদারিত্ব, দায়িত্বশীলতা, অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার নিরবচ্ছিন্ন চর্চা করে চলেছেন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তিনি বরাবর আপসহীন ও অকুতোভয়। মুক্তচিন্তা, প্রগতিশীল মূল্যবোধ আর মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে সোচ্চার গোলাম সারওয়ার বাংলাদেশের সাংবাদিকতা জগতের প্রতিষ্ঠানতুল্য ব্যক্তিত্ব।

গোলাম সারওয়ারের জন্ম ১৯৪৩ সালের ১ এপ্রিল বরিশালের বানারীপাড়ায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। বাবা মরহুম গোলাম কুদ্দুস মোল্লা ও মা মরহুমা সিতারা বেগম। পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে স্নাতক সম্মানসহ এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় তিনি ১৯৬২ সালে চট্টগ্রামের দৈনিক *আজাদী*র বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা হিসেবে সাংবাদিকতা শুরু করেন। বছরখানেক পর দৈনিক *সংবাদ*-এ সহসম্পাদক হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত *সংবাদেই* ছিলেন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। দেশাত্মবোধ থেকে যোগ দেন মহান মুক্তিযুদ্ধে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে তখনকার আলোচিত দৈনিক *ইত্তেফাক*-এ সিনিয়র সহসম্পাদক হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত দৈনিক *ইত্তেফাক*-এ প্রধান সহসম্পাদক, যুগ্ম বার্তা সম্পাদক ও বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। দৈনিক *ইত্তেফাকে* দীর্ঘ ২৭ বছর বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব পালনকালে তিনি একাধারে সৃজনশীল ও পেশাদার সাংবাদিকতায় অতুলনীয় দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। দৈনিক *ইত্তেফাকে* থাকাকালীন *ইত্তেফাকে*র সংস্কৃতি সাপ্তাহিক *পূর্বাণী*রও নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন বেশ কিছুদিন। *পূর্বাণী*তে তারই সম্পাদনায় এ দেশে ম্যাগাজিন আকারে বৃহদায়তনের ঈদসংখ্যা প্রকাশের রীতি শুরু হয়। তার নেতৃত্বে *পূর্বাণী* অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

গোলাম সারওয়ার দেশের দুটি সেরা দৈনিক *যুগান্তর* ও *সমকাল*-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। সৃজনশীল সম্পাদক হিসেবে এ দুটি সংবাদপত্রকে তিনি মর্যাদার এক অনন্য স্তরে নিয়ে যান। তার সুযোগ্য নেতৃত্ব, মেধা ও অসামান্য সাংগঠনিক দক্ষতা দুটো

পত্রিকাকেই দ্রুততম সময়ে পাঠকপ্রিয় করে তোলে। দলমতের উর্ধ্বে উঠে সত্যকে সত্য ও মিথ্যাকে মিথ্যা বলার মতো সাহস প্রদর্শনের মাধ্যমে গোলাম সারওয়ার বরাবর দায়িত্বশীল সাংবাদিকতাকে স্বীয় পেশার সঙ্গে অভেদ্য ভেবেছেন। তাই চটকদার সংবাদ পরিবেশনে অস্থিরতা তৈরিতে কখনোই তার মন সায় দেয় না; বরং দেশ ও জাতির সপক্ষে তার অবস্থান সবসময়ই হয় সবকিছুর আগে। সে কারণে সম্পাদক গোলাম সারওয়ার জাতির অন্যতম অভিভাবক; দুর্যোগ-দুর্বিপাকে, যে কোনো সংকটে বিপন্ন মানুষের আস্থার কণ্ঠস্বর অবশ্যই দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা – আর এ দেশে গোলাম সারওয়ার স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে এ ধারার সাংবাদিকতার অগ্রপথিক।

১৯৯৯ সালে প্রকাশিত দৈনিক *যুগান্তর-এর* সম্পাদক এবং এর ছয় বছর পর ২০০৫ সালে নতুন ধারার দৈনিক *সমকাল*-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি *সমকাল*-এর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বরত। গোলাম সারওয়ারকে 'সাংবাদিকদের শিক্ষক' হিসেবে অনেকেই অভিহিত করেন। তার হাতে গড়া অন্যূন পাঁচ শতাধিক সাংবাদিক এখন দেশের বিভিন্ন পত্রিকা ও টিভি মিডিয়ায় কাজ করছেন। বাংলাদেশের সংবাদপত্রের বিকাশ ও ক্রমপরিণতির ইতিহাসে গোলাম সারওয়ারের নাম অতি গুরুত্বের সঙ্গে ইতিহাসে বারবার উচ্চারিত হবে। শৌখিন, কুটির শিল্পসদৃশ সংবাদপত্রের ক্ষীণ বলয় থেকে বর্তমান বাংলাদেশের বৃহৎ কলেবরের সংবাদপত্রের অভিযাত্রার অন্যতম সফল পথিকৃৎ সম্পাদক গোলাম সারওয়ার। তিনিই প্রথম এ দেশে প্রতিদিন রঙিন খেলার পাতা, বিনোদন পাতা, নানা স্বাদের গুচ্ছ গুচ্ছ ফিচার প্রকাশ করার রীতি প্রবর্তন করে দৈনিক পত্রিকার চেনা অবয়বকে পাল্টে দিয়ে একটি দৈনিককে পরিবারের সব সদস্যের উপযোগী করে তোলার পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়িত করেন। সংবাদকে গুরুত্ব দিয়ে যথাযথ ট্রিটমেন্টে তার সমতুল্য কোনো সম্পাদক এ দেশে নেই – এটি অপরাপর সম্পাদকের ভাষ্যেই বহুবার উচ্চারিত হয়েছে।

সাংবাদিক হিসেবে গোলাম সারওয়ার খ্যাতিমান হলেও বাংলাদেশের ছড়া সাহিত্যে তিনি এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। ষাট দশকে অসংখ্য ছড়া লিখেছেন তিনি। সত্তর দশকেও অনেক দিন ছড়ায় সচল রেখেছিলেন কলম। *রঙিন বেলুন* শীর্ষক বইটি তার ছড়া সৃষ্টির উজ্জ্বল নিদর্শন। সাংবাদিকতার সূত্রেই বেশ কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। তার স্বাদু গদ্যের সুনাম সাংবাদিক ও বিদগ্ধ পাঠকমহলে সুবিদিত। তার প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *সম্পাদকের জবানবন্দি*, *অমিয় গরল*, *আমার যত কথা* এবং *স্বপ্ন বেঁচে থাক*।

গোলাম সারওয়ার সেই বিরল প্রজন্মের সাংবাদিক, যিনি সাহিত্যের ধ্রুপদী রস ও ভঙ্গিমা অনায়াসে নিজের মধ্যে আত্তীকৃত করে দৈনন্দিন খবরকে ভিন্নমাত্রায় পরিবেশনে অসামান্য রকম দক্ষ। বিভিন্ন সংবাদ সম্পাদনায় তার রচিত ইনট্রো বা সম্পাদনা কৌশল পরবর্তী প্রজন্মের সাংবাদিকদের কাছে অনুকরণীয় বিষয় হয়ে উঠেছে। সংবাদ শিরোনামে ক্ষিপ্র ও সংক্ষিপ্ত গদ্য, দ্রুতরেখ পর্যবেক্ষণ ও কাব্যিক অনুষঙ্গ এবং ফটো

ক্যাপশনে ইঙ্গিত, প্রতীকসহ সমকালীন কবিতার ব্যবহার তাকে তুলনারহিত অবস্থানে নিয়ে গেছে। বস্তুত আপাদমস্তক সংবাদ-অন্তপ্রাণ গোলাম সারওয়ার নিজের আবাল্য সাহিত্যপ্রেম, ক্ষুরধার সংবাদমনস্কতা, তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ও তুলনারহিত স্মৃতিশক্তির সমবায়ে নিজেকে বাংলা ভাষার সাংবাদিকতায় অতুল্য এক উচ্চতায় স্থাপন করেছেন।

গোলাম সারওয়ার বাংলাদেশের দৈনিক সংবাদপত্রগুলোর সম্পাদকদের সংগঠন বাংলাদেশ সম্পাদক পরিষদেরও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তিনি প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের চেয়ারম্যান।

সাংবাদিকতায় জীবনব্যাপী অনন্য ভূমিকার জন্য তিনি ২০১৪ সালে একুশে পদকে ভূষিত হন। ৭৩ বছর বয়সী গোলাম সারওয়ার এ দেশের সংবাদপত্রের সাফল্য ও পেশাদারিত্বের প্রতীক।

যাঁর নামে ট্রাস্ট

আতাউস সামাদ

আতাউস সামাদের জন্ম ১৯৩৭ সালের ১৬ নভেম্বর, ময়মনসিংহে। বাবার চাকরির সুবাদে হুগলি, কলকাতা, জলপাইগুড়িসহ এপার বাংলা-ওপার বাংলার বহু জায়গা তিনি ছোট বেলায় ঘুরেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, ৫২-র ভাষা আন্দোলন, ৬৯-র গণঅভ্যুত্থান, ৭১-র মুক্তিযুদ্ধ, ৯০-র গণআন্দোলনসহ নানা ঘটনার সাক্ষী আতাউস সামাদ প্রায় ৫০ বছর সাংবাদিকতা করেছেন।

বাবার বদলির সুবাদে জলপাইগুড়ির ইন্দ্রাজমল মিডল ইংলিশ স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হন আতাউস সামাদ। বরিশাল থেকে মাধ্যমিক পাশ করে ১৯৫২ সালে ভর্তি হন বজ্রমোহন কলেজে। কিন্তু বাবার বদলির কারণেই ঢাকায় সলিমুল্লাহ নাইট কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েই তিনি ফজলুল হক হলের প্রচার সম্পাদক হন, জড়িয়ে পড়েন সংস্কৃতি সংসদের সাথে। এ সময়ে তিনি *সচিত্র সন্ধানী* নামে একটি পত্রিকা বের করার কাজে মনোনিবেশ করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ালেখায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। ১৯৫৯ সালে অনার্স পরীক্ষার পর তিনি দৈনিক *সংবাদ*-এ সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। কেজি মুস্তাফা, এবিএম মূসা, আব্দুল আওয়াল খান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ তাঁকে সাংবাদিকতায় আসার পেছনে প্রেরণা যুগিয়েছেন।

আতাউস সামাদ রিপোর্টিংয়ের কাজটি শুরু করেন দৈনিক *আজাদ*-এ। এ পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে ১৯৬১ সালের পেন সম্মেলন কাভার করেন তিনি। দৈনিক *আজাদ*-এ প্রথম পৃষ্ঠায় বিশাল করে তাঁর রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছিল। মূলত এটাই ছিল তাঁর প্রথম রাজনৈতিক রিপোর্ট। সাংবাদিক হিসেবে তখন থেকে তাঁর পরিচিতি শুরু হয়। এর ছয় মাস পরে তিনি *দি পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকায় যোগ দেন। মাত্র ২৫ বছর বয়সে সেখানে তিনি চিফ রিপোর্টার হয়েছিলেন। *অবজারভার*-এ কাজ করার সময়ে তিনি সাংবাদিক ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারিও হন। পরে মালিক বিরাগভাজন হয়ে পড়লে তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে ১৯৬৯ সালে *দি সান* পত্রিকায় যোগ দেন। তখন *দি সান* এর হেড অফিস ছিল পাকিস্তানের করাচিতে। আওয়াল খান, ফায়জা হক এবং তিনি ছিলেন পূর্ব

পাকিস্তান প্রতিনিধি। সাংবাদিকতার জগতে পুরো ষাটের দশকটি কেটেছে তাঁর কর্মমুখর সময়। শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবরের মতো বড় বড় রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতা, সংবাদ সম্মেলন ও কাজকর্ম নিয়মিত রিপোর্ট করতেন তিনি।

মুক্তিযুদ্ধের রক্তঝরা দিনগুলোতে আতাউস সামাদ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুজিবনগরে তথ্য পাঠাতেন। সংবাদ সংগ্রহ করে নতুন কাগজকে মাটি দিয়ে ঘষে পুরানো করে তাতে লিখতেন, আর ছেঁড়া খামে করে তা পৌঁছে দিয়ে আসতেন নির্ধারিত জায়গায়। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে রাজাকার, আল-বদর বাহিনীর যোগসাজশে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সাংবাদিক নিধন শুরু করে। দৈনিক *ইত্তেফাক*-এর চিফ রিপোর্টার খন্দকার আবু তালেবকে মিরপুরে জবাই করে হত্য করে পাকবাহিনী। আর *মর্নিং নিউজ*-এর রিপোর্টার বাশারকেও ধরে নিয়ে যায়। এ সময়ই আতাউস সামাদের নয়াপল্টনের বাড়িতে আল-বদর বাহিনী হানা দেয়। কিন্তু আল-বদররা তাঁকে পায় নি। এরকম পরিস্থিতিতে আতাউস সামাদ ভারতে চলে যান।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আতাউস সামাদ *বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থায়* (বাসস) যোগ দেন। তখন বাসসের চিফ এডিটর ছিলেন ফয়েজ আহমদ। *বাসস*-এ আতাউস সামাদের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদের সাথে দিলি যাত্রা। এ যাত্রায় তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরেও তিনি ভারত-পাকিস্ড়ান যুদ্ধের পরে রাশিয়ার উদ্যোগে আয়োজিত শান্তি আলোচনা কাভার করতে *অবজারভার*-এর চিফ রিপোর্টার হিসেবে দিল্লি গিয়েছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন *দি মর্নিং নিউজ*-এর বদরুদ্দীন আর *সংবাদ* থেকে শহীদুল্লাহ কায়সার। দিল্লিতে তিনি *বাসস*-এর প্রতিনিধি হিসেবে সাড়ে চার বছর কাজ করেন। ছয় মাস পর তিনি আবার *বাসস*-এ বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন। তার পরের কর্মক্ষেত্র ছিল *বাংলাদেশ টাইম*। ১৯৭২ সালে তিনি আতিকুল আলমের মাধ্যমে *বিবিসি*তে স্টিঙ্গার হিসেবে যোগ দেন। এ সময়ে আতাউস সামাদ এরশাদ সরকারের অপকীর্তির নানা খবর *বিবিসি*তে প্রচার করতেন। আর এরই ফলে ১৯৮৭ সালের নভেম্বরে গণআন্দোলনের সময় এরশাদ তাঁকে জেলে আটকে রাখেন। ছাড়া পাওয়ার পর পাঁচ মাস পর্যন্ত তিনি কোনো কাজ করতে পারেন নি *বিবিসি*র উপর নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে।

১৯৮৫ সালে উড়িরচরে সাইক্লোন, ১৯৮৭-৮৮ সালের বন্যা, ১৯৯১ সালে উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় এবং স্বৈরাচার পতন আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ সব খবর *বিবিসি*তে পরিবেশন করেছেন আতাউস সামাদ। ১৯৮০-এর দশকের শুরুর দিকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৯৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ছেড়ে দেন। এছাড়াও

বিভিন্ন সময়ে তিনি *আরব টাইমস*, *ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর*, *ডেকান হেরাল্ড* পত্রিকায় রিপোর্ট করেছেন। *ভোরের কাগজ*-এ তাঁর লেখা 'এই সময়, এই জীবন' এবং *যায়যায়দিন*-এ 'আটলান্টিকের দুই তীরে' কলাম দুটি খুবই জনপ্রিয় ছিল। দৈনিক *মাতৃভূমি*র সম্পাদকীয় উপদেষ্টা হিসেবে তিনি কাজ করেছেন কিছুদিন। দৈনিক *আমার দেশ*-এর উপদেষ্টা সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।

আতাউস সামাদের প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে একটি হলো *একালের বয়ান*। তিনি ভারত, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, লিবিয়া, মিসর, কুয়েত, চীন, বার্মা, ফ্রান্স, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, তুরস্কসহ অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন।

সাংবাদিকতার জন্য সংবর্ধনা ও পুরস্কার পেয়েছেন অনেক। ১৯৯২ সালে তিনি একুশে পদকে ভূষিত হন। ২০১৩ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

যাঁর উদ্যোগে ট্রাস্ট

এবিএম মূসা

সাংবাদিক, কলাম-লেখক আবুল বাশার মুহাম্মদ (এবিএম) মূসা বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় প্রবাদতুল্য পুরুষ। পঞ্চাশ দশক থেকে আজ অবধি দেশের সংবাদ মাধ্যমের ক্রমবিবর্তনের পথে যাঁরা অবিস্মরণীয় অবদান রেখে চলছেন এবিএম মূসা তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৩১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া থানার কুতুবপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাবা আশরাফ আলী ছিলেন সে সময়ের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর মায়ের নাম মাজেদা খাতুন। তারুণ্যের শুরুতেই রাজনৈতিক চেতনা তাঁকে শিহরিত করতো। তিনি জীবনকে দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন ভিন্নমাত্রায়, ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে।

বাবার বদলির সুবাদে চট্টগ্রামের গভর্নমেন্ট মোসলেম হাই স্কুলে মাধ্যমিক পর্যায়ের পড়াশুনা করেছেন এবিএম মূসা। ১৯৪৫ সালে তাঁর বাবা আবার নোয়াখালী ফিরে এলে নোয়াখালী জেলা স্কুল ভর্তি হন তিনি। ১৯৪৬ সালে তিনি এ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে ইন্টারমেডিয়েট ও চৌমুহনী কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন।

কলেজ জীবন থেকেই এবিএম মূসা লেখালেখির সাথে জড়িত ছিলেন। চৌমুহনী কলেজে ছাত্রাবস্থাতে তিনি *কৈফিয়ত* নামে একটি পত্রিকা বের করতেন। এছাড়া ফেনীতে খাজা আহমদের সাপ্তাহিক *সংগ্রাম*-এও নিয়মিত লিখতেন। এরপর বিএ পরীক্ষা দিয়ে ১৯৫০ সালে ঢাকায় এসে তিনি *ইনসাফ* পত্রিকায় সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। পেশাগত সাংবাদিকতার শুরুর দিকে এক দল সাংবাদিক বের হয়ে আসেন, তাদের অনেকে যোগ দেন *ইনসাফ* পত্রিকায়। এর বার্তা সম্পাদক ছিলেন কেজি মুস্তাফা। এই *ইনসাফ* পত্রিকায় তিন মাস কাজ করার পর এবিএম মূসা শিক্ষানবিশ সহ-সম্পাদক হিসেবে ১৯৫০ সালের নভেম্বরে *পাকিস্তান অবজারভার*-এ যোগ দেন। অ্যাডভোকেট শেহাবুদ্দিন আহমদ তখন *অবজারভার*-এর নামমাত্র সম্পাদক, মূল কাজ করতেন আবদুস সালাম। সৈয়দ নূরুদ্দীন তখন *অবজারভার*-এর বার্তা সম্পাদক ছিলেন।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন ছাপার কারণে *পাকিস্তান অবজারভার* বন্ধ হয়ে গেলে এবিএম মূসা দৈনিক *সংবাদ*-এ যোগ দেন। ১৯৫৪ সালে

আবার *অবজারভার* প্রকাশিত হলে সেখানে তিনি সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫৭ সালে তিনি এ পত্রিকার বার্তা সম্পাদক হন। ১৯৬১ সালে কমনওয়েলথ প্রেস ইনস্টিটিউটের বৃত্তি নিয়ে তিনি লন্ডনে যান। অক্সফোর্ডে কুইন এলিজাবেথ হাউজে তিনি সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা করেন। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি *অবজারভার*-এর সনাতনী চেহারা বদলে দেন। সেখানে যুক্ত করেন নতুন বিষয় ও নবতর অঙ্গসজ্জা। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি *অবজারভার*-এর বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব নিরবচ্ছিন্নভাবে পালন করেন। বার্তা সম্পাদক হিসেবে তাঁর সাহস ও দৃঢ়তাই *পাকিস্তান অবজারভার*কে ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার করে তোলে। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান ও বহির্বিশ্ব বাঙালির মনের কথা জানতে পারতো *পাকিস্তান অবজারভার* পড়ে। ৬০-এর দশক এবিএম মূসা বাংলাদেশের পত্রিকায় কাজ করার পাশাপাশি *বিবিসি*, লন্ডনের *দি টাইমস*, *দি ইকোনমিস্ট*সহ বিভিন্ন বিদেশি গণমাধ্যমের বাংলাদশ প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। *লন্ডন টাইমস*-এর প্রখ্যাত সাংবাদিক হ্যারল্ড ইভান্সের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে হ্যারল্ড ইভান্সের উদ্যোগ এবিএম মূসা হংকঙে যান। আবার হ্যারল্ড ইভান্সের পরামর্শ মোতাবেকই সেখান থেকে মুজিবনগরে গিয়ে যুদ্ধের খবরাখবর সংগ্রহ করে বিদেশি গণমাধ্যমে পাঠাতেন। হংকংভিত্তিক বার্তা সংস্থা এশিয়ান নিউজ এজেন্সির মাধ্যমে এবিএম মূসা ভারত থেকে যুদ্ধের খবর *বিবিসি*কে জানাতেন। কেননা একাত্তরের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ভারতে *বিবিসির* কার্যক্রম বন্ধ ছিল।

মুক্তিযুদ্ধে শেষে দেশে ফিরে আর কোন পত্রিকায় যোগ দেননি এবিএম মূসা। এ সময়ে তিনি *বিবিসি*, লন্ডনের *দি টাইমস*, *নিউইয়র্ক টাইমস* ও *ইকোনমিস্ট* পত্রিকার সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করেছেন। বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার পর তিনি *বাংলাদেশ টেলিভিশন*-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) পদে নিয়োগ পান। এর কিছুদিন পর তিনি *মর্নিং নিউজ* পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৭৩ সালে এবিএম মূসা আওয়ামী লীগের মনোনয়নে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর তিনি আবার লন্ডনে চলে যান। সেখানে তিনি *সানডে টাইমস* পত্রিকার রিসার্চ ফেলোর কাজ পান। বিদেশে তিনি ১৯৭৭ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ইউএসইপির আঞ্চলিক তথ্য পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। দেশে ফিরে তিনি প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের মহাপরিচালক এবং তারপর বার্তা সংস্থা *বাসস*-এর প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচলক পদে কাজ করেন।

*প্রথম আলো*র সম্পাদক মতিউর রহমানের অনুরোধ ও উৎসাহে এবিএম মূসা কলামিস্ট হিসেবে আবির্ভূত হন। ১৯৯৫ সালের ১৮ মার্চ *ভোরের কাগজ*-এ তাঁর প্রথম কলাম 'আবদুল গাফফার চৌধুরী বন্ধুবরেষু' ছাপা হয়। এরপর তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় কলাম লিখছেন। ইংরেজি সাপ্তাহিক *কুরিয়ার*-এও তিনি দুই বছর লিখেছেন। ১৯৯১

সালে *নিউজ ডে* নামে একটি ইংরেজি দৈনিকে সম্পাদক হিসেবে বছর খানেক কাজ করেন। ২০০৪ সালে কিছুদিন তিনি দৈনিক *যুগান্তর*-এর সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন।

এবিএম মূসা পাকিস্তানের সাংবাদিকদের ইউনিয়ন আন্দোলনের অন্যতম কর্তা ছিলেন। তিনি জাতীয় প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম। প্রয়াত এসএম আলী যখন ১৯৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি হিসেবে পাকিস্তান জার্নালিস্টস ওয়েজ বোর্ডের সদস্য, এবিএম মূসা তখন ঐ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নেরও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। সে সময়েই প্রথম বেতন বোর্ড রোয়েদাদ কার্যকর হয়।

১৯৬৫ সালে তাসখন্দে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে চুক্তি সম্পাদন করার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশসহ বিভিন্ন কারণে এবিএম মূসা আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনি প্রখ্যাত সাংবাদিক আব্দুস সালামের বড় জামাতা। তাঁর স্ত্রী সেতারা মূসা, মেয়ে পারভিন সুলতানা ঝুমা প্রত্যেকেই সাংবাদিকতা পেশায় পরিচিত নাম। ২০১৪ সালের ৯ এপ্রিল দেশবরেণ্য সাংবাদিক এবিএম মূসা পরলোকগমন করেন।

স্মারক বক্তা

সৈয়দ আবুল মকসুদ

সৈয়দ আবুল মকসুদের জন্ম ১৯৪৬ সালের ২৩ অক্টোবর মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলার এলাচিপুর গ্রামে। মা সালেহা বেগম ছিলেন উত্তর প্রদেশের ফয়েজাবাদের অধিবাসী উর্দুভাষী এবং বাবা সৈয়দ আবুল মাহমুদ কাব্যচর্চা করতেন, রয়েছে তাঁর দুটি বই, ভ্রমণকাহিনি *কাশ্মীর* এবং কবিতা *পুষ্পমালিকা*। সৈয়দ আবুল মকসুদ শিক্ষাগ্রহণ করেছেন মাধ্যমিক ঝিটকা আনন্দ মোহন উচ্চ বিদ্যালয়, উচ্চমাধ্যমিক ঢাকা কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং সাংবাদিকতায় উচ্চতর প্রশিক্ষণ জার্মানির বার্লিনস্থ 'ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর জার্নালিজম' থেকে।

সৈয়দ আবুল মকসুদ বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সাহিত্যিক ও জনপ্রিয় কলাম লেখক। তাঁর কবিতা, প্রবন্ধ, গবেষণা, ভ্রমণকাহিনি প্রভৃতি বইয়ের সংখ্যা ৩০টির বেশি।

ছাত্রজীবনে তিনি ছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মী ও বামরাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। একাত্তরে ২৫ মার্চের পরে মস্কোপন্থী ন্যাপের নেতা ক্যাপ্টেন (অব) আবদুল হালিম চৌধুরীর গঠিত মুক্তিবাহিনীর সদস্য ছিলেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা রাখা ছাড়াও কলকাতা থেকে প্রকাশিত আবদুল মান্নান সম্পাদিত '*জয়বাংলা*' পত্রিকায় প্রতিবেদন পাঠাতেন। ১৬ ডিসেম্বরের পর বাংলাদেশ সরকারের ইনফরমেশন সেল-এ যোগদান। বাহাত্তরের জানুয়ারি থেকে বার্তা সংস্থা *বাংলাদেশ প্রেস ইন্টারন্যাশনাল* (সাবেক *পিপিআই*) এ যোগ দেন, যা পরে *বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার* সঙ্গে অঙ্গীভূত করা হয়। *বাসস*-এ ছিলেন বার্তা সম্পাদক ও উপ-প্রধান বার্তা সম্পাদক। তাঁর বন্ধু হুমায়ুন আজাদকে যখন উগ্রবাদীরা কুপিয়ে আহত করে তা নিয়ে *প্রথম আলোতে* প্রকাশিত একটি লেখার জন্য বিএনপি-জামায়াত সরকার থেকে কলাম লেখা বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়ায় তার প্রতিবাদে ২০০৪-এর ৯ মার্চ তিনি *বাসস* থেকে পদত্যাগ করেন। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিক *সুপ্রভাত বাংলাদেশ*-এর তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

সৈয়দ আবুল মকসুদের গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে কবিতা *বিকেলবেলা ও দারা শিকোহ ও অন্যান্য কবিতা*, ভ্রমণ কাহিনী *জার্মানীর জর্নাল* ও *পারস্যের পত্রাবলি*, প্রবন্ধ *যুদ্ধ ও*

মানুষের মূর্খতা, *বাঙালির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার*, *নির্বাচিত সহজিয়া কড়চা*, গবেষণা *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবন ও সাহিত্য*, (দুইখণ্ড), *গোবিন্দচন্দ্র দাস*, *হরিশচন্দ্র মিত্র*, *রবীন্দ্ররাজনীতি*, *ঢাকার বুদ্ধদেব বসু*, *বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দশ দার্শনিক*, *মওলানা আবুল হামিদ খান ভাসানী*, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা*, *স্যার ফিলিপ হার্টগ* প্রভৃতি।

সৈয়দ আবুল মকসুদ বাংলাদেশে গান্ধী গবেষণার পথিকৃৎ। মহাত্ম গান্ধী সম্পর্কে তাঁর বইগুলোর মধ্যে রয়েছে *নোয়াখালী গান্ধী মিশন ডায়েরি*, *Gandhi Nehru and Noakhali, Pyarelal's Unpublished Correspondence: The Noakhali Peace Mission of Mahatma Gandhi* প্রভৃতি। তিনি 'মহাত্মা গান্ধী স্মারক সদন'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান।

একজন গান্ধীবাদী শান্তিকর্মী হিসেবে আমেরিকার ইরাক আক্রমণের প্রতিবাদে তিনি ইঙ্গো-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সত্যাগ্রহ শুরু করেন এবং পাশ্চাত্য পোশাক ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বর্জন করেন।

সাহিত্যে সামগ্রিক অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার, মওলানা ভাসানী জাতীয় পুরস্কার, ঋষিজ পুরস্কারসহ বিভিন্ন পদক-পুরস্কারে ভূষিত হন তিনি। তাঁর *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা* (২০১৬) প্রথম আলো বর্ষসেরা গ্রন্থ হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে।

সৈয়দ আবুল মকসুদ পরিবেশ ও সামাজিক আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ও মানবাধিকার কর্মী। বহু সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে তিনি যুক্ত। তিনি বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)-এর সহ-সভাপতি এবং বাংলা একাডেমির ফেলো।

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীবৃন্দ (বিএসএস, ২০১৬ শিক্ষাবর্ষ)

মোতাসিম বিল্লাহ

মো. আল-আমিন মোল্লা

আব্দুল বারিক

মো. আল-আমিন

মো. ইব্রাহিম মল্লিক

আতাউস সামাদ স্মারক ট্রাস্ট ফান্ড

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

'আজীবন সম্মাননা, স্মারক বক্তৃতা ও বৃত্তি প্রদান, ২০১৭'

প্রধান অতিথি: অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক; উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
বিশেষ অতিথি: অধ্যাপক মফিজুর রহমান; চেয়ারপারসন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
সভাপ্রধান: অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন, কোষাধ্যক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
আজীবন সম্মাননা: গোলাম সারওয়ার।
স্মারক বক্তা: সৈয়দ আবুল মকসুদ।
তারিখ: ২২ জানুয়ারি, ২০১৭।
স্থান: অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরী মিলনায়তন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
আয়োজক: গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।